মো. হাবিবুর রহমান

পঞ্চগড়ের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ফোকলোর

পঞ্চগড়ের ফোকলোর তথা লোকসংস্কৃতির বহুবিধ অনুষঙ্গে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিচিত্র প্রসঙ্গ এসেছে বহুমাত্রিক চেতনায়। বাঙালি জাতিয়তাবাদ বা জাতিসত্তার মানস গঠনে হাজার বছরের ঐতিহ্যিক সংস্কৃতির যে অবদানের কথা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত, পঞ্চগড় জনপদের গ্রামীণ জীবন, লোকসমাজ ও সংস্কৃতি তথা ফোকলোর তার সুদৃঢ় উত্তরাধিকারভূমি। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চগড় অঞ্চল স্বাধীন বাংলাদেশ, এক সময়ের পূর্ব পাকিস্তান, পূর্ববঙ্গ কিংবা প্রাচীন অখণ্ড বাংলার ভৌগোলিক পরিসরে ফোকলোরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে পরিচিত। একারণেই পঞ্চগড়ের অনেক ফোকলোরিক উপাদান-উপকরণ বিশেষত লোকছড়া, লোকসঙ্গীত বা পুঁথি ও পালাগানগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বৈচিত্র্যময় আলেখ্য। আসলে ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ও ঘৃণা তা ফোকলোরের মাধ্যমে মুসলিম সমাজ থেকে হিন্দু সমাজ, খ্রিস্টান-বৌদ্ধ এবং অসংখ্য আদিবাসী সমাজকে প্রভাবিত করেছিলো। যার ফলে-ধর্মীয় ভিত্তিতে বিভক্ত মানুষ শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় সমাজ হিসেবে নয়, সংঘবদ্ধ হয়েছিলো বাঙালি হিসেবে, বাংলাদেশি হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটেছিলো তা আঞ্চলিক সংস্কৃতি তথা ফোকলোরের ভিত্তিতেই ঘটেছিলো। পঞ্চগড়ের ফোকলোরিক উপাদান বিশেষত ছড়া, পালাগান বা লোকসঙ্গীতগুলো থেকে এই সত্যটি বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

বর্তমানে ফোকলোরভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা জরুরি। কেননা ফোকলোরের ব্যাপকতম চর্চাই আমাদের জাতীয় চরিত্র, জাতীয় ঐক্য ও দর্শন নির্মাণে বিশেষভাবে সহায়তা করতে সক্ষম। মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু নিয়ে বাঙালির মধ্যে যে বিতর্ক বা মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে মুক্তি দিতে পারে এই সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন। পঞ্চগড়ের ফোকলোর হচ্ছে এখানকার জনপদবাসীর নিজস্ব জীবনের আন্তরিক ভাষ্য। তাদের সামগ্রিক চিন্তার পরিচয় প্রকাশ পায় তাদের নিজ ফোকলোরিক উপাদানগুলোর মাধ্যমে। জাতির মর্মকথা লোককবিরা তাদের দরদি ভাষায়, আবেগে আর যত্নে প্রচার করেছেন, প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের রাজনৈতিক বিষয়আশয় ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত অসংখ্য লোকগান, ছড়া ও কবিতা সেই সময় জাতীয় চেতনা জাগ্রত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এসব গানের যেমন ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি এগুলোর ভেতরের ইতিহাসও প্রচলিত ইতিহাসের প্রামাণিকতা বিচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সেক্ষেত্রে এগুলো প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি পাবার দাবি রাখে।

জনপ্রবাহের দিক থেকে অর্থাৎ গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের দিক থেকে ইতিহাস তৈরি হয় না; যা তৈরি হয় তা মৌখিক ঐতিহ্য, লিখিত দলিল থাকে না এসবের। জনগণের এই মৌখিক শিল্পই তার নিজস্ব ইতিহাস, যার সাথে সে নিজে একাত্মতা অনুভব করে। যেমন শেখ মুজিব নিজেই লিখেছেন, 'পথে পথে গান চলল। নদীতে বসে আব্বাস উদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে।' রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যে ইতিহাস দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ, নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে-বাইরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস, তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হয় না। বলাবাহুল্য, এই উজ্জ্বল ধারণার জন্য ঐতিহাসিককে ফোকলোরের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। পঞ্চগড়ের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক লোকছড়া-গানগুলোর রচয়িতা এখানকার লোককবি বা লোকশিল্পীগণ। অজ্ঞাতনামা এ সকল লোককবির ছড়া-গানে আবহমান বাংলার লোকসমাজ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সভ্যতার পরিচয় আমরা পেয়ে যাই। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের ইতিহাস যেমন নানাভাবে তার প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে তেমনি এতদঞ্চলের লোক ছড়া-গানের মধ্যেও সেই ইতিহাসের প্রাণপ্রবাহটি সঞ্চারিত হতে দেখতে পাই। তাই ১৯৭১-এ পাকিস্তান সরকারের শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সব ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাংলার

অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় পঞ্চগড়ের সাধারণ জনগণ ফোকলোরকে আশ্রয় করেই প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছিলো। সেইসব লোকগান ও লোকছড়া কাহিনিতে আজো সেই প্রতিবাদ ধ্বনি বিধৃত হয়ে আছে। এসব উপাদান থেকে কৃষিজীবী এখানকার বাঙালি জনগণের সংগ্রামী মনোভাবেরও জোরালো দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ মেলে। যার ফলে প্রচলিত ইতিহাসের সমর্থনে গবেষকগণ বিশেষ দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করতে পারেন। এইসব লোকছড়া-গানগুলোর এমন কতগুলো সুর রয়েছে যা দেশবাসীকে স্বদেশ চেতনায় উজ্জীবিত করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা বা চেতনার মধ্যে এটি হলো একটি বিশেষ ও শক্তিশালী দিক যা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে ও প্রভাবিত হতে সাহায্য করে।

এসব কারণে বর্তমান গবেষণায় পঞ্চগড়ের মৌখিক ঐতিহ্য তথা ফোকলোরিক উপাদানের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে এ অঞ্চলের ইতিহাস ও স্থানীয় জনমানসে এর প্রভাবকে অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় ফোকলোরিক দৃষ্টিভঙ্গী খুব একটা চোখে পড়ে না। অথচ কোন জাতির সমাজ-সংস্কৃতির বা লোক ঐতিহ্যের ভিত্তি মজবুত না হলে সে জাতি কখনোই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না। কেননা জাতির ফোকলোরই হলো জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা ও মুক্তির প্রেরণার উৎসভূমি।

লক্ষ্য করা গেছে, পঞ্চগড় অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় সংশ্লিষ্ট যে কয়েকটি প্রকাশনা রয়েছে সেগুলোতেও ফোকলোর উপেক্ষিত থেকেছে। ড. নাজমুল হক রচিত *পঞ্চগড় জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* গ্রন্থটিতে এ অঞ্চলে **১৯৭১** এর অসহযোগ আন্দোলন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ, সশস্ত্র প্রতিরোধ, গেরিলা যুদ্ধ, নির্যাতন ও গণহত্যার বিষয়ে আলোচনা রয়েছে কিন্তু এখানকার ফোকলোরিক উপাদানগুলোতে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে তা অনালোচিত থেকেছে।

একইরকমভাবে শফিকুল ইসলাম রচিত *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস: পঞ্চগড় জেলা* গ্রন্থটিতে এ অঞ্চলের বিজয়ের কথা, নির্যাতন-গণহত্যার কথা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা প্রসঙ্গসমূহ এলেও স্থানীয় লৌকিক ঐতিহ্যে মুক্তিযুদ্ধের কোন চিত্র অন্বেষণ করা হয় নাই।

পঞ্চগড় জেলা মুক্তিযুদ্ধের সময় বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার অধীনে ছিল। অথচ *মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার অবদান* গ্রন্থটিতেও এ উল্লেখযোগ্য বিষয়টির অনুসন্ধানটি উপেক্ষিত থেকেছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে গবেষক সুলতান আহমেদ *৬নং সেক্টর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* শিরোনামে একটি পিএইচডি গবেষণা ২০০৩ সালে সম্পন্ন করেন। যা এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটিতেও পঞ্চগড়ের আঞ্চলিক সাহিত্য, সংস্কৃতিতে তথা ফোকলোর উপাদানে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ স্থান পায়নি।

স্থানীয়ভাবে পঞ্চগড় জেলা প্রশাসন ও পঞ্চগড় পৌরসভা কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকাগুলোতেও এ ধরনের কোন বিষয় স্থান পায়নি। এইসব বিবেচনায় আলোচ্য গ্রন্থটি ফোকলোরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পঞ্চগড় অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস। যা একটি বড় ধরনের গবেষণা শূন্যতা পূরণ করতে সহায়ক।

বর্তমান রচনায় পঞ্চগড় অঞ্চলের ফোকলোরের বাহক বা গ্রামীণ জনগণের কাছে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ফোকলোরের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সহজবোধ্য দুটি শাখা ছড়া ও লোকসঙ্গীত বা পুঁথিগানকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাঠপর্যায়ে প্রাপ্ত কিছু ফোকলোরিক উপাদান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগারের ফিল্ড রিপোর্ট আকারে সংরক্ষিত থাকায় সেইসব রিপোর্ট থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের পর পঞ্চগড় অঞ্চলের জনজীবন, মানসিকতা, আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির বিষয়টি বিবেচনায় Context Analysis বা প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য একাধিক ব্যক্তির নিকট থেকে একই ধরনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছড়া ও লোকসঙ্গীত সংগৃহীত হওয়ায় এই রচনাতে কেবল একজনের তথ্যই বিশ্লেষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণা প্রবন্ধটির কলেবর তথ্যভারে বৃদ্ধি না করে বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পঞ্চগড়ের অধিবাসী, যাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং যারা নানাভাবে সহায়তা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণা অঞ্চল

ভৌগোলিক সীমারেখায় পঞ্চগড়ের বর্তমান অবস্থান বাংলাদেশের একেবারে উত্তর সীমান্তে। এর উত্তরে ভারতের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা; উত্তরপূর্ব ও পূর্বে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা এবং বাংলাদেশের নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলাদ্বয়; পশ্চিমে ভারতের উত্তর দিনাজপুর

এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে ঠাকুরগাঁও ও ভারতের উত্তর-দিনাজপুর জেলাদ্বয় অবস্থিত।

ঐতিহাসিকভাবে নানা বিবর্তনের পর ইংরেজ শাসিত ভারতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট দেশ বিভাগের ফলে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি আলাদা রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে সময় র‍্যাডক্লিফ-রোয়েদাদ অনুসারে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার দশটি থানা ভারতশাসিত পশ্চিম বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গঠিত হয়। অপরদিকে ভারতের পশ্চিম বাংলার জলপাইগুড়ি জেলা হতে তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ ও পাটগ্রাম এই পাঁচটি থানা তৎকালীন দিনাজপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। পরে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলাকে ভেঙে যে তিনটি জেলা গঠন করা হয় প্রান্ত উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড় সেগুলোর অন্যতম।

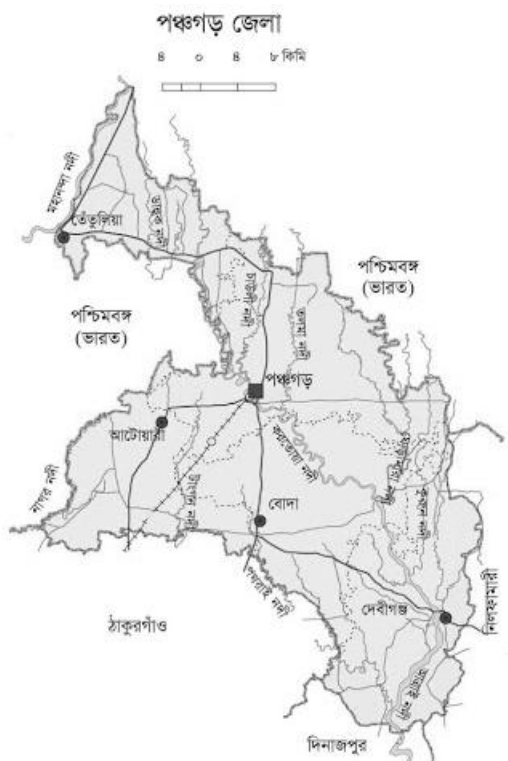

ছবি: পঞ্চগড় জেলার মানচিত্র

২৬ ডিগ্রি ২০ মিনিট উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮ ডিগ্রি ৩৪ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত পঞ্চগড় জেলা হিসেবে নবগঠিত ও আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এর পারিপার্শ্বিক ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই জেলার সীমান্ত রেখা অত্যন্ত আঁকাবাঁকা ও ভঙ্গুর। পঞ্চগড় জেলার তিনদিকেই ভারতীয় সীমান্ত। জেলার প্রায় ১৮০ মাইল বা ২৮৮ কিঃমিঃ এলাকাই সীমানা বেষ্টনি দিয়ে রেখেছে ভারত।

পঞ্চগড়ের ফোকলোর, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা তথা মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত পঞ্চগড়ের ফোকলোর আলোচনায় এখানকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার অবতারণা ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ও বিষয়ের যথার্থতা অনুধাবনে অপরিহার্য। কারণ মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের মতো এখানকার মানুষেরও জীবনচর্চা-মননশীলতা ও সৃজনশীলতায় অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া কোন দৈব ঘটনা নয়। তাছাড়া নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিচারে ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকে বিভিন্ন যুগের অসংখ্য ঐতিহাসিক কীর্তি ও স্মৃতি এই ভূমির বুকে সমাহিত। এই ভূমি বাংলার ইতিহাসের আদি ভূমি। লাল-গৈরিক মাটি আর শাল-পিয়াল-পলাশ-মহুয়ার প্রকৃতিতে এখানকার মানুষের সামাজিক জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে এতদঞ্চলের স্বতন্ত্র ফোকলোরিক ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারারই অনবচ্ছিন্ন উত্তরাধিকার। ইতোমধ্যে ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও আধুনিক লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধান, গবেষণাদির মাধ্যমে পঞ্চগড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির নানা রূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। ভগ্ন মন্দির, প্রস্তর, ধাতব ও মৃন্ময় মূর্তি, তাম্রপট লিপি, লোকধর্ম, লোকউৎসব প্রভৃতির মাধ্যমে এই সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে, এই অঞ্চলটি সংস্কৃতিসমৃদ্ধ এক জনপদ। ইতিহাসখ্যাত পৌণ্ড্র-বরেন্দ্র-গৌড়ের হৃদয়কেন্দ্রে অবস্থিত জনপদসমূহের মধ্যে এই অঞ্চল সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বরাবরই ছিল স্বকীয়-স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ১৭৬৩-১৮০০ সালের ফকির বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভাগা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ স্থানীয় ও জাতীয় নানা আন্দোলন-সংগ্রামে এখানকার মানুষ যেমনি বুকের তাজা রক্তে সিক্ত করেছে মাটি তেমনি সমৃদ্ধ করেছে তাদের জীবনচর্চা ও কৃষ্টি সংশ্লিষ্ট নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বা ফোকলোর।

পঞ্চগড়ে মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ফোকলোর প্রসঙ্গ

পঞ্চগড়ের ফোকলোর উপাদানসমূহে মুক্তিযুদ্ধের নানা চিত্র বিশেষত আওয়ামী নেতাদের তৎপরতা, পাকিস্তানি বাহিনীর Last Defance Camp অমরখানা ঘাটি, শরণার্থী জীবনের অবস্থা এবং পঞ্চগড় শহর উদ্ধারে ভারতীয় বাহিনীর বোমা বর্ষণ ও সহায়তার প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে নানাভাবে। একারণে পঞ্চগড়ের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ফোকলোর আলোচনায় এখানকার মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন জরুরি। যাকে contextual study বা প্রসঙ্গ সূত্র নির্ভর বিশ্লেষণ বলা যেতে পারে।

পঞ্চগড়ে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অফিস ছিল সোনালী ব্যাংকের সামনে ওয়াপদা এক্সটেনশন বিল্ডিং-এ। ৭ই মার্চের পর থেকে তারা মিছিল মিটিং তথা সর্বস্তরের জনগণকে এবং ই.পি.আর. ক্যাম্পের বাঙালি ই.পি.আরদের সংগঠিত করতে থাকে। মাগুরমারি, ভূতিপুকুর, মাঝিপাড়া, অমরখানা, ভজনপুর, মীরগড়, গিরাগাঁও এবং রতনীবাড়ি সীমান্ত ফাঁড়িগুলোতে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী পঞ্চগড় শহরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই পুরো শহরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এসময় অনেকেই ভারতে আশ্রয় নেয়, আবার অনেকেই মুক্ত এলাকা তেঁতুলিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

পাকিস্তানি বাহিনী পঞ্চগড় থানায় প্রবেশ করার পর ডাকবাংলো এবং পুলিশ স্টেশনে ক্যাম্প স্থাপন করে। অতঃপর তারা বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলে। মুক্তিযোদ্ধারা সহজেই যেন পুনরায় পঞ্চগড় শহরে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য তারা ফকিরহাট, ফুলতলা, পঞ্চগড় চিনিকল, রেলওয়ে ষ্টেশন, গোড়াইডাংগা, জালাসি, হাসাপাতাল, ডাকবাংলা এবং অমরখানায় অবস্থান নেয়। অতঃপর পাকিস্তানি বাহিনী পঞ্চগড় থেকে তেঁতুলিয়া থানার দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু ভজনপুর পর্যন্ত গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় বাহিনীর ভীতির কারণে পুনরায় ফিরে এসে অমরখানা ই.পি.আর ক্যাম্পে শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। অমরখানাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল, তাদের ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং মিলিশিয়া বাহিনী মিলে প্রায় দু'কোম্পানি সৈন্য ছিল। তারা অমরখানার বিরাট এলাকা নিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলে। অগণিত বাংকার, ট্রেঞ্চ, পিলবক্স আর ক্রলিং ট্রেঞ্চ তৈরি করেছিল। তাদের বাংকারের কাছাকাছি যাওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। ব্যাংকারের সামনে ছিল মাইন ফ্লিড এবং সর্বদা সতর্ক প্রহরী ও কড়া নিরাপত্তা।

পঞ্চগড় থেকে পাকিস্তানি বাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্যই ভারতের চাউলহাটিতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। যাতে মুক্তিযোদ্ধারা সহজেই পঞ্চগড়ে প্রবেশ করে গেরিলা তৎপরতা অব্যাহত রাখতে পারে। পঞ্চগড়ের ভেতরগড় সীমান্ত থেকে সোজাসুজি দু'কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত চাউলহাটি। পরবর্তী সময়ে চাউলহাটি ক্যাম্পটিকে জহুরী বাজার সংলগ্ন আম বাগানে স্থানান্তর করা হয়। স্থানটি ছিল ভাটপাড়া বি.এস.এফ ক্যাম্পের পিছনে। এই ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন মেজর শংকর। এ ক্যাম্পে দু'প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। প্রতি প্লাটুনের সংখ্যা ছিল ৪৫ জন। ক্যাম্পটি স্থাপন করা হয়েছিল ২৩ জুন। টোকাপাড়া যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধারা পুনরায় চাউলহাটি ক্যাম্পে ফিরে যায়। মেজর শংকর মধ্য জুলাই থেকে গেরিলা যুদ্ধের ধারা পরিবর্তন করে দেয়। পরিকল্পনা হয়, ভারতীয় সীমান্ত থেকে আর অধিকৃত পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ নয়। মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত পেরিয়ে নিজ দেশের ভিতর ঘাঁটি স্থাপন করবে, আর সেখানে অবস্থান করেই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে যাবতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, আর পরিচালনা করতে হবে যুদ্ধ। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী চাউলহাটি ইউনিট ব্যাচের মুক্তিযোদ্ধাদের চারটি কমান্ডে ভাগ করা হয়। ১৩ জুলাই মেজর সুলতান শাহরিয়ার রশীদকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান কার্যালয় মুজিব নগর থেকে ৬নং সেক্টরের ১নং সাব-সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। তিনি ১৭ই জুলাই মুক্ত এলাকা তেঁতুলিয়ায় এসে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি মুক্ত এলাকায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। এরা হলেন তৎকালীন আনসার-মুজাহিদ, ই.পি.আর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টর জোয়ানরা। তার মধ্যে তৎকালীন ৯ নং ই.পি. আর উইং-এর জোয়ানের সংখ্যাই ছিল বেশি। এদেরকে নিয়ে 'বি' ও 'সি' নামে কোম্পানি গঠিত হয়। এ কোম্পানির কমান্ডার সুবেদার আহমেদ হোসেন প্রাক্তন ই.পি.আর 'বি' কোম্পানি কমান্ডার, হিসেবে সুবেদার খালেক প্রাক্তন ই.পি.আর. এবং 'সি' কোম্পানির কামান্ডার হিসেবে সুবেদার আবুল হোসেন প্রাক্তন ই.পি.আর-কে দায়িত্ব দেয়া হয়। এদের সাথে যোগ দিয়েছিল স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা। লক্ষ্য ছিল অমরখানা পাকিস্তানি ঘাঁটি ধ্বংস করা। জুলাই মাসে টাস্কফোর্স দু'কোম্পানি এবং এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে শত্রু ঘাঁটি আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ই.পি.আর-দের সাহায্যে প্রথমে আক্রমণ চালানো হয়। তবে বেশির ভাগ আক্রমণে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীরও সাহায্য নেয়া হয়। আগস্ট মাসের

২ তারিখ ভজনপুরে ব্যাটালিয়ান হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয়। ৪ আগস্ট ভজনপুর থেকে কোম্পানি দেবনগরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলে। সেখানে অবস্থানকালে তারা ময়নাগুড়ি, কামারপাড়া, বিলখাজুদ, ফকিরপাড়া, নয়াপাড়াসহ সাত-আট মাইল জায়গা দখল করে নেয়। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধারা জাবরীদুয়ার, গোয়ালঝার, বানিয়াপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া, বামনগাঁও, কামাদা ও ভেলকুপাড়া দখল করে নেয়।

২২ নভেম্বর ভোর রাতে মেজর শাহরিয়ার রশিদের নেতৃত্বে তিনটি কোম্পানি পুনরায় পাকিস্তানি ঘাঁটি অমরখানা আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করার সাথে সাথে ভারতীয় আর্টিলারী রেজিমেন্ট পাকিস্তানি বাহিনীর উপর শেলিং করতে থাকে। এছাড়াও ভারতীয় বি.এস.এফ বাহিনী পিছন দিক থেকে কভারিং ফায়ার দিয়ে সাহায্য করে। সম্মিলিত বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি বাহিনী বিকাল পাঁচটার দিকে পিছু হটে যায়। মুক্তিবাহিনী সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে অমরখানা পদানত করে। সেদিনই ভারতীয় ১২ রাজপুতনা রাইফেল রেজিমেন্ট অমরখানার সম্মুখে রেজিমেন্ট অবস্থান নেয়। ফলে যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন হয়ে যায়। পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটে জগদল হাটে অবস্থান নেয়। ২৩ নভেম্বর রাতে মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় বাহিনী সম্মিলিতভাবে জগদল হাট পাকিস্তানি ঘাঁটি আক্রমণ করে। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় ও আর্টিলারি শেলিং চলতে থাকে। অবশেষে ২৪ নভেম্বর বিকাল বেলা পাকিস্তানিরা জগদলহাট ছেড়ে পঞ্চগড় অভিমুখে পশ্চাদপসারণ করে শিংপাড়ায় অবস্থান নেয়। অপরদিকে সম্মিলিত বাহিনী জগদলহাট দখল করে প্রতিরক্ষা ব্যূহ করে তোলে। এ যুদ্ধে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয় এবং ত্রিশজন আহত হয়।

পঞ্চগড় শহরে পাকিস্তানি বাহিনীর ছিল মজবুত ঘাঁটি। এখানে প্রায় তাদের তিন ব্যাটালিয়ান সৈন্য নিয়োজিত ছিল। চারিদিকে ছিল পাকা বাংকার এবং মজবুত ট্রেঞ্চ। ২৬ নভেম্বর মধ্য রাত থেকে এক ব্যাটালিয়ান মুক্তিবাহিনী ও দু'ব্যাটালিয়ান ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে পঞ্চগড় শহরে পাকিস্তানি ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি বাহিনীও মুক্তিযোদ্ধাদের উপর তীব্র আক্রমণ চালায়। উভয় পক্ষের মধ্যে সারারাত যুদ্ধ চলে। এ রাতে ভারতীয় বাহিনীর একশত জনের মত জোয়ান ও বাইশ জন মুক্তিবাহিনীর সদস্য হতাহত হয়। ২৭ নভেম্বর সারাদিন যুদ্ধ চলে। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখেও পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান ছিল অনড়। তাদের ধ্বংস

করার জন্য ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তানি ঘাঁটির উপর বিমান থেকে বোমা বর্ষণ শুরু করে। ২৮ নভেম্বর রাতে পুনরায় ভারতীয় বাহিনীর তিন ব্যাটালিয়ান এবং কয়েক শত মুক্তিযোদ্ধা নতুন করে তাদের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। সে রাতে ভারতীয় আর্টিলারী রেজিমেন্ট ৬০টি গান থেকে একসাথে শেলিং করে। ঐ রাতে প্রায় ছয় হাজার গোলা পাকিস্তানি ঘাঁটির উপর নিক্ষিপ্ত হয়। অপরদিকে পাকিস্তানি বাহিনী সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণের মুখে পাকিস্তানিদের সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে পাকিস্তানি বাহিনী ভোর রাতে পঞ্চগড় ছেড়ে পিছু হটে ময়দান দীঘিতে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলে। ২৮ তারিখ রাতের যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর দু'শত পঞ্চাশ জনের মত আহত হয় এবং সাতাশ জন পাকিস্তানি বাহিনীর সৈন্য জীবিত ধরা পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রচুর অস্ত্র গোলাবারুদ ও বেশ কিছু গাড়ি হস্তগত করে। ২৯ নভেম্বর পঞ্চগড় শহর শত্রু মুক্ত হয়। পঞ্চগড় শহর তখন ভূতুড়ে নগরীতে পরিণত ছিল। বোমার আঘাতে সব-কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। পঞ্চগড় সুগার মিল দখল করার সময় পাকিস্তানি বাহিনীর গোলার আঘাতে হারুন-অর-রশিদ নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়।

বোদায় মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১) বড়শশী ইউনিয়নের অমরখানা ক্যাম্প (অমরখানার ক্যাম্পটি স্থাপন করা হয় মোবারক হোসেনের বাড়িতে), ২) বড়শশী ইউনিয়নের সাকাতি পাড়া ক্যাম্প (আলাউদ্দিন- মন্টুর বাড়ি), ৩) নাউতারা জামাদার পাড়া ক্যাম্প (আব্দুর বাড়ি এই ক্যাম্প থেকে মুক্তিযোদ্ধারা দেবীগঞ্জ, ডোমার এবং চিলাহাটি এলাকায় তৎপরতা চালাত, এ ক্যাম্পের কমান্ডার ছিলেন আব্দুল মালেক। তিনি ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক), ৪) কাজলদীঘি কালিগঞ্জ ইউনিয়নের 'পেয়াদাপাড়া ক্যাম্প' (মিঠুর বাড়ি), ৫) কাজলদীঘি কালিগঞ্জ ইউনিয়নের সরদার পাড়া ক্যাম্প (খোরশেদ আলীর বাড়ি)। এ ক্যাম্পগুলো থেকে মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার এবং পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাঁটিতে গেরিলা আক্রমণ চালাত। তারা যাতে গাড়ি নিয়ে মাড়েয়ার দিকে আসতে না পারে, সে জন্য মুক্তিযোদ্ধারা বোদা-মাড়েয়া রাস্তার উপর নির্মিত ব্রিজ ধবংস করে দেয়। ৩০ নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হয়ে ঠাকুরগাঁও হয়ে বীরগঞ্জে অবস্থান নেয়। ঐ দিন অর্থাৎ ৩০ নভেম্বর বোদা থানা শত্রু মুক্ত হয়।

তেঁতুলিয়া ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত এলাকা। পাকিস্তানি বাহিনীর পদচারণা ছিল অমরখানা পর্যন্ত। ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় পতনের সাথে সাথেই অনেকেই মুক্ত এলাকা তেঁতুলিয়ায় আশ্রয় নেয়। এখানে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে 'স্থানীয় প্রতিরোধ কমিটি' (Local Defense Committee) গঠিত হয়। এ কমিটিকে সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এ উপদেষ্টা কমিটি তেঁতুলিয়া থানার সমস্ত অস্ত্র তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে এবং স্থানীয়ভাবে যুবকদের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা ও ভারতে যুবকদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে পাঠানোর জন্য একটি রিক্রুটিং ক্যাম্প স্থাপন করে। তেঁতুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে স্থাপিত হয় কন্ট্রোল রুম, যা থানা আওয়ামী লীগ সদর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত করা হত। এ কন্ট্রোল রুম থেকে মুক্তাঞ্চলের যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হত। ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড়ে যে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তেঁতুলিয়ায় আশ্রয় নেয় তাদেরকে দিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করা হয়। জুন মাস থেকে শুরু হয় বিদেশি পর্যটক, সাংবাদিক এবং ভারতীয় নেতাদের আগমন। ৯ জুন তৎকালীন মন্ত্রী কামারুজ্জামান, ৬ জুলাই ভারতীয় নেতা অরুন মৈত্র (এম.এল.এ), পীযুষকান্তি গুহ, ৭ জুলাই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম.এ.জি জেনারেল ওসমানী এবং ১২ অক্টোবর পুনরায় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহম্মদ পরিদর্শন করতে আসেন। এছাড়াও ভারতীয় নেতাদের মধ্যে বলিলাম ভগত, ত্রাণমন্ত্রী আর. কে. খাদিলকার, লেঃ জেঃ লছমন সিং, কর্ণেল ব্যানার্জী, ক্যাপ্টেন শিখারওয়ার এসেছেন যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখতে। বিদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে আসেন আভানাক (দিল্লির রেডিও সেন্টার), নীলিমা সেন রায় (দিল্লি), মার্ক টালী (বি.বি.সি সংবাদদাতা)। এখান থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগণের মনোবল বৃদ্ধির জন্য 'সাপ্তাহিক সংগ্রামী বাংলা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশকাল ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১। পত্রিকাটির মূল্য ছিল বিশ পয়সা। পত্রিকাটি মুক্তাঞ্চলের প্রশাসনিক কার্যক্রম, গেরিলা তৎপরতা, মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাভিযান এবং মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের খবরা-খবর প্রকাশ করত।

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেবীগঞ্জ থানায় 'সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি ছাড়াও অত্র এলাকার যুবকদের নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। স্থানীয়ভাবে উক্ত কমিটিকে 'দুরমুজ কমিটি' বলা হত। এ কমিটির কাজ ছিল বিভিন্ন রাস্তায় রাস্তায় পরিখা খনন ও মোটা

মোটা গাছ কেটে ফেলে দিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলা এবং স্বাধীনতার বিপক্ষের লোকদের মধ্যে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। ১৬ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী ডোমার হয়ে দেবীগঞ্জ থানায় প্রবেশ করে। পাকিস্তানি বাহিনী দেবীগঞ্জ শহরে প্রবেশ করেই থানার ওসি আব্দুল কাদেরকে হত্যা করে। স্বাধীনতাকামী জনতাকে সহযোগিতা করার জন্যই তাকে হত্যা করা হয়। তাকে ওপেন চৌকিতে (ভাজনী গ্রাম) কবর দেয়া হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তানি বাহিনী ঠাকুরগাঁও থেকে দেবীগঞ্জ নিয়ন্ত্রণ করত। নভেম্বর মাস পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনী দু'এক দিন পর পর ঠাকুরগাঁও থেকে এসে টহল দিয়ে চলে যেত। ২৫ নভেম্বর থেকে মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিদিন দেবীগঞ্জ থানায় অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনী এবং রাজাকার ক্যাম্পের উপর গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ চালাতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা দিনের বেলা ছদ্মবেশে রেকি করত এবং রাতের বেলা আক্রমণ চালাত। তবে এখানে বড় ধরনের কোনো যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি। ৮ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে পাকিস্তানি বাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হতে থাকে। সকাল আটটার সময় যুদ্ধ শুরু হয়। প্রায় ছয়-সাত ঘণ্টা যুদ্ধ স্থায়ী হয়। সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটে ডোমার হয়ে সৈয়দপুর সেনানিবাসে অবস্থান নেয়। উক্ত যুদ্ধে কেউ নিহত হয়নি। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রস ফায়ারে দেবীগঞ্জ কৃষি ফার্মের গাড়ি চালক আবু সাঈদ মারা যায়। ৮ ডিসেম্বর দেবীগঞ্জ থানা শত্রু মুক্ত হয়। ভারতীয় সীমান্তবর্তী আটোয়ারী থানার বোধগাঁও, ঘেরাগাঁও, সোনাপাতিয়া ও বর্ষালু পাড়ায় ই পি আর ক্যাম্প ছিল। এখানে শান্তি কমিটি গঠিত হয় নাই। ২২ নভেম্বর শত্রু মুক্ত হলে ঐদিন বিকালে আটোয়ারী থানায় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলিত হয়।

পঞ্চগড়ের লোকছড়ায় মুক্তিযুদ্ধ

পঞ্চগড়ের ফোকলোরের উল্লেখযোগ্য একটি শাখা ছড়া। এখানকার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছড়াগুলো হলো স্থানীয় জনগণের সংগ্রামী চেতনার ফসল ও সৃষ্টিশীল আবেদনের ফলশ্রুতি। যা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। লোকমানসে আপনা আপনিজাত এবং হৃদয় সঞ্জাত বলে এখানকার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছড়াগুলোর আবেদন চিরকালীন, সংগ্রামী, গণহত্যা-নির্যাতনের প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী মানুষের হৃদয়ের নিকট নিত্য প্রকাশমান এবং বাঙালির মুক্তির আলোয় জ্যোতির্ময়। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হল।

নৌকা বিনা গতি নাই

পঞ্চগড়ের ছড়াসমূহে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি আলোচনার শুরুতেই ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের বিষয়টি স্মতর্ব্য। কেননা এই নির্বাচনই পাকিস্তানি শাসক-জান্তাদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সেই সময়ে আওয়ামী লীগের স্বপক্ষে যেসব রসালো রাজনৈতিক ছড়া শোনা যেত তার অনেকগুলোকেই পঞ্চগড়ের লোককবি-সাহিত্যকগণ স্থানীয় লোকঐতিহ্যের রূপ দিয়েছিলেন। যেমন:

হামার নৌকা চলে ভাসিয়া
সিল মারবেন হাসিয়া ॥
সাইকেলত ভাই নাইরে পাম্প
নৌকাত চড়ে হাটে যান ॥
হারিকেনের সইলতা নাই
নৌকা বিনা গতি নাই।

১৯৭০-এর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দলসমূহের প্রতীক ছিল নৌকা, সাইকেল, হারিকেন ইত্যাদি। আওয়ামী লীগের প্রতীক নৌকা তখন এখানকার গ্রামীণ জনমানসে স্থান করে নিয়েছিল অটুটভাবে। এ কারণে অন্যান্য প্রতীকগুলোর ত্রুটির কথা জনগণকে মনে করিয়ে দিয়ে গ্রামীণ লোকছড়াকার 'নৌকা বিনা গতি নাই'-এর কথা বলে জনগণকে এই প্রতীকে আনন্দের সাথে ভোট প্রদান করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে।

এহিয়া খানের গালাত টান

উক্ত নির্বাচনে পঞ্চগড়ে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীগণ জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদেই বিপুলভাবে জয় লাভ করলে উত্তর জনপদের জনমানসে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। তাই ১৯৭১ এর ৩ মার্চ পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা মাত্র বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের মতো পঞ্চগড়েও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় গর্জে ওঠে স্থানীয় ছাত্র জনতাসহ আপামর মানুষ। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু 'যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা' করার নির্দেশ দিলে স্থানীয় আওয়ামী লীগের তুখোড় নেতা এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, কমরুদ্দিন আহমেদ, মোশাররাফ হোসেন-এর নেতৃত্বে বিশাল বিশাল মিছিল সমাবেশে জনগণ প্রকম্পিত করে তোলে স্থানীয় হাট-বাজার-গ্রাম। জনপ্রিয় নেতা এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম তাঁর তেজোদীপ্ত বক্তব্যের কারণে

পঞ্চগড়ের অনেক লোকজনের কাছে 'পাগলা সিরাজুল' বলে পরিচিত ছিলেন। গ্রামীণ ছড়াকার তার বাগ্মিতার বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন লোকজ মেজাজে, লোকজ ভাষায়—

চারিদিকে কিসের রোল
সেরাজুলডা হইল পাগল ॥
পাগলা মিয়ার ভাষণখান
এহিয়া খানের গালাত টান ॥

ছড়াটিতে ইয়াহিয়া খানকে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে 'এহিয়া খান' এবং 'গালাত টান' বলতে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর প্রতীকী প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

এহিয়া ব্যাটার বাড়ি

পূর্বোক্ত ছড়াটির মতোই ইয়াহিয়া খানের প্রসঙ্গ এসেছে নিম্নোক্ত ছড়াটিতেও। যেখানে মুক্তিফৌজদের কৃতিত্বের বিষয়টি প্রতিফলিত হতে দেখা যায়:

দেশি পাটা তোষা পাটা
বুয়াল মাছের দাড়ি।
মুক্তিফোজ ঘেরিয়া নিছে
এহিয়া ব্যাটার বাড়ি।

পচাগড়টা স্বাধীন কর

এরকমই আরেকটি ঐতিহাসিক চিত্র লক্ষ করা যায় নিম্নোক্ত ছড়াটিতে। যেটিতে স্থানীয় ছাত্র-যুবকসহ সকলকে মুক্তিযুদ্ধে যাবার আহ্বান জানানো হয়েছে:

ধর রে ভাই অস্ত্র ধর
পচাগড়টা স্বাধীন কর।
টিকিয়া মিয়ার টিকিত টান
পানি হাগার গোরস্তান ॥

ছড়াটির ভাবার্থ বিশ্লেষণে দেখা যায়, এখানে টিক্কাখানকে ব্যঙ্গ করে টিকিয়া খান বলে তাকে তৎকালীন হানাদার বাহিনীর স্থানীয় দুর্গ 'অমর খানা' ক্যাম্পের পার্শ্বস্থ পানিহাগা নামক স্থানে কবর দেবার জন্য লোকজনকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য অমরখানা ক্যাম্প ছিল পাকিস্তানিদের Last defence Camp. এই ক্যাম্প থেকে অনেকগুলো বড় বড় অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।

পচ্ছিম পাড়ার কুকর লা

পঞ্চগড়ের সমাজ-জীবনের দর্পণ হিসেবে প্রতিভাত হওয়া লোকছড়াগুলোতে কেবল তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক বিষয় বা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিত্রই নয়, সাধারণ জনমানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের দুর্বিষহ অনুষঙ্গও বাণীরূপ লাভ করেছে। ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে, **১৯৭১** এর **১৫** এপ্রিল পাকিস্তানি কাহিনি কর্তৃক ঠাকুরগাঁও শহরের পতন হলে স্বাধীনতাকামী ইপি আর- আনসার ও সাধারণ জনতা সশস্ত্র অবস্থায় পঞ্চগড় শহরের নিকটবর্তী করতোয়া নদীর উত্তর পাশে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলেছিল। হানাদার বাহিনী যাতে পঞ্চগড় শহরে প্রবেশ করতে না পারে তাই ছিল উদ্দেশ্য। এই সময় শহরের লোকজন গ্রামে আশ্রয় নিতে থাকে। দলে দলে পালাতে থাকে সীমান্ত এলাকার দিকে। এসময় অসংখ্য পরিবার ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। লোকছড়াকার এই প্রসঙ্গটি এনেছেন গ্রামীণ রূপক আর স্থানীয় উপমায়–

পচাগড়ত ঢুকিল বলে
পচ্ছিম পাড়ার কুকর লা।
উচুক ভুচুক পালায় যাছে
মাইয়া ছুয়া ঢেনি লা ॥

এই ছড়াটির ভাবার্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে পচ্ছিম পাড়ার কুকর বলতে পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে। পঞ্চগড়কে তখন স্থানীয়ভাবে পচাগড় বলা হতো। এই পচাগড় শহরে হানাদার বাহিনীর আসার খবর শুনে সাধারণ লোকজন 'উচুক-ভুচুক' তথা ভীত-উদ্ভ্রান্ত হয়ে দিগ্বিদিক পালিয়ে যেতে থাকে। ছড়ার স্থানীয় ভাষায় মাইয়া-ছুয়া-ঢেনি বলতে মহিলা-শিশু ও যুবতী নারীদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগের কথা বোঝানো হয়েছে।

চল গে সুন্দরী হিন্দুস্তান

১৯ এপ্রিল হানাদার বাহিনী ট্যাংক সহকারে শেলিং করতে করতে পঞ্চগড় শহরে প্রবেশ করে। তারও পূর্বে মুক্তিযোদ্ধা সাধারণ জনগণ তাদের গতিরোধে ব্যর্থ হয় এবং শত্রুবাহিনীর আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটতে থাকে। উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধে সুবেদার হাশেম গুরুতরভাবে আহত হলে তাকে ভারতীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।

হানাদার বাহিনী ক্রমান্বয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান বুঝে ধীরে ধীরে গ্রাম-গ্রামান্তর হয়ে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তারা পঞ্চগড় শহরে প্রবেশ করেই পুরো শহরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এ আগুনের লেলিহান শিখায় যেমন ধূলিস্মাৎ হতে থাকে হাট-বাজার-বাড়িঘর, তেমনি দ্বগ্ধ-বিবর্ণ ও ফ্যাকাসে হতে থাকে সাধারণ মানুষের ব্যক্তি জীবনের দীর্ঘলালিত স্বপ্ন-ভালোবাসার। তাই দেখা যায়, হানাদার বাহিনীর রক্তের হোলি খেলা থেকে পরিত্রাণ পেতে পার্শ্ববর্তী ভারতে আশ্রয় নেবার জন্য তার প্রেমিকাকে আহ্বান জানিয়েছে জনৈক যুবক। ব্যক্তি জীবনের এমনতর একান্ত সুক্ষ্ম অনুভূতিটি গ্রামীণ কবি ছড়ার ভাবচিত্রের ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছে এভাবে—

চিনি চাম্পা পানের বাটা
রক্ত পরে ফোটা ফোটা।
গোল গোল সুপারী
চ্যাপ্টা-চ্যাপ্টা পান,
চল গে সুন্দরী হিন্দুস্তান।

পঞ্চগড়ের লোকসঙ্গীতে মুক্তিযুদ্ধ

লোকসঙ্গীতে প্রধানত লোকায়ত সমাজ-জীবনের চিত্র, ব্যক্তি মানুষের ভাব-কল্পনা, আনন্দ-বেদনার কথা থাকে। পঞ্চগড় অঞ্চলের লোকসঙ্গীতেও এমনটি ঘটেছে। সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, অত্যাচার, নির্যাতন, লড়াই ও বিজয়ের কথাই এসব গানের কথা ও সুরে ফুটে ওঠে। মহান মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গ এবং স্থানীয় চিত্র এসবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। শ্রুতিনির্ভর এই গানসমূহের কোন প্রচলিত স্বরলিপি না থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের পরিবেশ, জনজীবনের কষ্ট, শরণার্থী অবস্থা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ হলো এগুলোর উৎস। লোকপরম্পরায় এই সঙ্গীতগুলো যুগ যুগান্তর পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও প্রসঙ্গ পৌঁছে দিচ্ছে সেকাল থেকে একালে। স্থানীয় চটকা গান, কবি গান, হোলির গান, পুঁথি গান প্রভৃতি লোকসঙ্গীতে তা এখনো লক্ষ্যণীয়।

বাড়ি ঘরে রে ভাই রহিবার পারি না

লোকসঙ্গীত পঞ্চগড়ের ফোকলোরের একটি সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখা। তাই লোকছড়ার মতো লোকসঙ্গীতেও মহান মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গ ও ঘটনার

বিবরণ প্রকাশ পেয়েছে। পঞ্চগড় অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এ ধরনের একটি লোকসঙ্গীতে পাকিস্তানি খান বাহিনীর সাথে স্থানীয় বিহারীদের সখ্যতা, যুদ্ধকালীন সময়ের ভয়াবহতা ও শরণার্থী জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচিতি পাওয়া যায়। যেমন—

ওরে ধন্য ধন্য শেখ মুজিবুর
দেখালু হাজাক দার্জিলিং শহর
আরো দেখালু ভাই বিমোনিয়া পাথর।
ওরে দেশে লাগিছেরে গণ্ডগোল
খান বিহারী ভাইরে মস্তদল
বাড়ি ঘরে রে ভাই রহিবার পারি না ॥

লোকসঙ্গীতটির ভাবার্থ বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়, হানাদার বাহিনী ও বিহারীদের অত্যাচারে পঞ্চগড় অঞ্চলে যুদ্ধের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পায়। পঞ্চগড়ের পার্শ্ববর্তী ঠাকুরগাঁও ও সৈয়দপুরের সে সময় বিহারী সম্প্রদায়ের অনেক লোকের বসবাস ছিল। তাদের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনী অনেক স্থানেই অভিযান চালাতো, অন্যদিকে পাথরের মতো মন ও হৃদয়হীন পাকিস্তানিদের চরিত্রের খোলস খুলে দেবার জন্য এবং শরণার্থী জীবনে দার্জিলিং শহর বলে খ্যাত শিলিগুড়ি জনপদে নিরাপদ আশ্রয় পাবার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রামীণ সঙ্গীতকার ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

খায়া দায়া হামার হইছে ডাইরীয়া

শরণার্থী জীবনের করুণ একটি চিত্র প্রকাশ পেয়েছে উপরোক্ত গানটির এক অংশে। যেখানে শরণার্থী শিবিরে খাওয়ানো পচা আটা এবং ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হবার তথ্য পাওয়া যায়।

ওরে জমা রাখেরে ভাই ভুঁই ভিটা
খিলাছে হামাক পচা আটা।
খায়া দায়া হামার হইছে ডাইরীয়া।

ওরে ইন্দিরা গান্ধীরে ভাই ফোন করিল

উপরোক্ত লোকগানটির শেষাংশে পঞ্চগড় অঞ্চলের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি এবং শরণার্থী জীবনের দুর্বিষহ জীবনের পরিচিতি প্রকাশের পাশাপাশি তৎকালীন ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অবদান, দেশ স্বাধীন হওয়ার

প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছে। এছাড়া নয় মাস যুদ্ধের পর পরই দেশে যে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির তৈরি হয়েছিল সেই সময়ের বেদনাময় অবস্থার বিষয়টিও বাদ দেয়নি লোকসঙ্গীত রচয়িতা ও গায়কেরা। গানে তাই এসেছে-

ওরে ইন্দিরা গান্ধীরে ভাই ফোন করিল
জঙ্গি বিমান পাঠায় দিল
বোম ফেলাইল ভাই পঞ্চগড় আসিয়া
ওরে নয় মাস পর ভাই স্বাধীন হইল
বাঙালিরা ভাই ফিরা আইলো
খাবার দাবার বুঝি আর জুটে না ॥
ওরে মুইতো ভাই খাচু কচু
খায়া দায়ারে ভাই করিছে শেষ
এইতো হামার বাংলাদেশ ॥

ফান্দে পরি কান্দে ইয়াহিয়া খান

পুঁথি ফোকলোরের একটি বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গ। সাম্প্রতিক কালে পুঁথি রচনা বা পুঁথি পাঠের তেমন কোন প্রচলন দেখা না গেলেও একদা এটি ছিল গ্রামীণ জনমানুষের অবসর সময়ের বিনোদন মাধ্যম। পুঁথির লিপিমালার বক্তব্যের মাধ্যমে গ্রামীণ নিরক্ষর মানুষেরা দেশ-বিদেশের নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে অবহিত হতো। এরকমভাবেই পঞ্চগড়ের একটি পুঁথি গানে পাওয়া যায় মহান মুক্তিযুদ্ধের নানা ঘটনার আদ্যোপান্ত। যেখানে ইয়াহিয়া খানকে শয়তান, পাপিষ্ঠ এবং মীরজাফরের মতো পাপী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয় পাকিস্তানি বাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্যের আত্মসমর্পণ তথা '*ফান্দে পরে ইয়াহিয়া খানদের কান্দা*'র কথাও গৌরবের সাথে স্মরণ করা হয়েছে।

ওহে খোদাতায়ালা মাবুদ মাওলা দয়ার ও সাগর
মেহেরবান থাকিও তুমি এ ধর্মের উপর।
আমি মুর্খ ছেলে সরল মনে কলম ধরিলাম।
শয়তান ইয়াহিয়া খান পাপিষ্ঠ বহুকষ্ট দিলো বাঙ্গালীরে।
ওরসে থাকিয়া খোদা হইল বেজায় ভারী।
হেরে গেল মীরজাফরের জাতি খান পাপী।
বাঙালীরও সাথে না পারিল কোন রীতিনীতি... হায়রে।
বাংলাবাসীর শক্তি বেশি লাগিল লড়িতে।

এই দেখিয়া খান পাপী লাগিল ভাবিতে।
মুক্তিফৌজ ভাই ও পাতাল গেল।
ফান্দে পরি কান্দে ইয়াহিয়া খান।
এইবার শেষমেষ বন্দী হইল
মুক্তিফৌজ বাহিনীর কাছে ৯৩ হাজার খানের সৈন্য।
বাংলা স্বাধীন হইল, বাংলা স্বাধীন হইল।
খবর গেল পশ্চিম পাকিস্তানে।
আর ভুট্টো বলে খান পাঞ্জাবির গেল বুঝি সম্মান
আর বাংলা ছাড়রে!
বাংলাবাসী তোরাই বেশি শক্তি দেখালি।

মুক্তিযুদ্ধের মতোই লোকছড়া গানেও বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গের আবতারণা স্বাভাবিকভাবেই। ২৫ মার্চ-এর কালো রাতে বঙ্গবন্ধুকে শত্রুবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার করা, ইয়াহিয়া কর্তৃক তাকে জেলখানাতে বন্দি করা, রাওয়ালপিণ্ডির জেলে বন্দিজীবন, কবর দেবার হুমকি দেওয়া এবং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক এই সকল কোন কিছুরই পরোয়া না করার বিষয়টি পুঁথিগানটিতে এসেছে এভাবে:

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জেলখানাতে পুড়িল
মোদের প্রাণ প্রিয় নেতা দেশনেতা বঙ্গবন্ধুকে।
বঙ্গবন্ধুর শাস্তি দরগতি করিতে করিতে তার চাইল মারিয়া ফেলিতে।
দুষ্ট ইয়াহিয়া ধমক দিয়া বলে ঐ মুজিবুর
জীবিত অবস্থায় দিবো তর কবর।
স্বাধীনতার আশা তোকে মিটাই দিবো, জীবিত দিবো কবর।
এইবার না ছাড়িব না ছাড়িব দিবো তোকে কবর।
ধন্য শেখ মুজিব ভাই ব্রাদার ইয়াহিয়াকে কয়
ঐসব ধামকি না করিব আমি ভয়।
দরকার হইলে ঐ কবরে যাবো
তবু আমি বাংলা স্বাধীন করিবো।
আমার মারো তুমি, তবে আমি বলি তোমার কাছে
এই মুজিবের করব দিও বাংলার মাটিতে।

গানটির ভাবার্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা যখন বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা নিয়ে হীনমন্যতার পরিচয় দিচ্ছেন, তখন লোককবির

বয়ান থেকে আমরা পরিষ্কার হতে পারি যে ২৫ মার্চের হত্যাযজ্ঞের প্রতিক্রিয়াতে কেবল মুক্তিযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠেনি। এর সঙ্গে ২৫ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার হবার ঘটনা ছিলো বাঙালির ক্ষোভকে মুক্তি সংগ্রামের দিকে ধাবিত করার অন্যতম একটি প্রধান কারণ। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশ স্বাধীন করার অর্থ হয়ে যায় দেশকে শত্রুমুক্ত করা এবং বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে, পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করা।

মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগই যেখানে প্রধান ভূমিকা রেখেছে সেখানে তাদের উদ্দীপ্ত করার কাজে অবদান রেখেছেন লোককবিরা। মুক্তিযুদ্ধে মেজর কর্ণেলেরা অংশগ্রহণ করলেও সেখানে ক্যাম্পে ক্যাম্পে অর্ধ-শিক্ষিত, নিরক্ষর চারণ কবির গান গেরিলাদের উজ্জীবিত করেছে। আর এসব গানের মধ্যে ‘বঙ্গবন্ধু’ এসেছেন নানাভাবে। শুধু তাই নয়, মুক্তিবাহিনীকে উৎসাহ দিতে যে সব গণসঙ্গীত গীত হত লোকসুরে সেই সব গানের বাণীতে সঙ্গত কারণেই উঠে এসেছেন বঙ্গবন্ধু, তাঁর মুক্তি, দেশ ভাবনা ও স্বাধীনতার প্রসঙ্গ। তাই নিম্নোক্ত পুঁথিগানটিতে দেখা যায়, ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে রাওয়ালপিন্ডির জেল থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বঙ্গবন্ধু প্রথমে বিলেতে যান। বিলেতে তিনি যুদ্ধের ভয়াবহতা, খান বাহিনীর অত্যাচার, প্রায় এক কোটি বাঙালিকে ভারতের আশ্রয়দান প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলো শোনেন। লোককবি এই বিষয়গুলোকে এনেছেন এভাবে:

মুজিবর মুক্তি পাইল, মুজিবর মুক্তি পাইল,
বিলেত গেল ওহে বন্ধুগণ।
বিলেতবাসী বলল তখন বাংলার ভয়াবহ বিবরণ।
ওহে মুজিবর শোন ভাই দুঃখের খবর
৮০ লক্ষ বাংলাবাসী হিন্দুস্তানে।
খানের অত্যাচারে দেশ ছাড়িল বাংলাবাসী ভাই।
দয়া করে ভারত ভাই দিলো স্থান।
আর দয়া করে বাঙালীকে সাহায্য করিল।
তবে তো সোনার বাংলা স্বাধীন হইলো।

এই গানগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন ও বিশ্লেষণে এটি স্পষ্ট হয় যে, ফোকলোর দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে যারা উঠতে পারেন নি তাদের ক্ষেত্রে ফোকলোর বা মৌখিক ইতিহাসের পঠন পাঠন জরুরি, যা জনপ্রবাহের দিক

থেকে রচিত। সাধারণ মানুষের সৃষ্টিমুখী আবেদনকে অস্বীকার করে যে ইতিহাস রচিত তা দুর্বল। সেখানে রক্ষণশীল চেতনা, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা প্রাধান্য লাভ করে। সে তুলনায় লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্যের ভেতর আমরা আবিষ্কার করি সংগ্রামের উপযুক্ত কারণ। কেননা কোনরকম সংকীর্ণতা বা নীচতায় নয়, কেবলি বাংলার জনপদ, বাংলার মানুষ এবং বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধুর অবদানকে পঞ্চগড়ের গ্রামীণ কবি তাদের নিজস্ব চিন্তায় ও মননশীলতায় প্রকাশ করেছেন। নিম্নোক্ত গানটিতে দেখা যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিলেতে যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলার আপামর জনগণের উপর অত্যাচারের ভয়াবহতা, দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম হারানোর কথা শোনেন, তখন তিনি লজ্জায়-অপমানে-চরম বেদনায় সিক্ত হয়ে ওঠেন। গানটিতে একই সঙ্গে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বাংলাবাসী সাধারণ জনগণ তাকে জাতির জনক আখ্যায় আখ্যায়িত করাসহ, দেশ স্বাধীনের একটি চিত্রও প্রকাশ পেয়েছে—

শুনে দুঃখের খবর শেখ মুজিবের নয়ন দিয়ে ঝরে অশ্রু।
আরো শুনিল মুজিব ভাই দুই লক্ষ মা বোন হারিয়েছে সম্ভ্রম।
এই শরমে প্রিয় দেশনেতা হাত রাখিল মুখে।
অবশেষে বঙ্গবন্ধু মুজিব আইলো দেশে ফিরি।
বাংলাবাসী নিল তাকে বরণ করে।
বানালো জাতির জনক বঙ্গবন্ধু।
এই বলি ক্ষ্যান্ত করি ভাই আমার বাংলার
আমার সোনার বাংলার যুদ্ধের বিবরণ।
ক্যামনে হলাম মোরা বাংলাবাসী স্বাধীন।

মূল্যায়ন

পঞ্চগড়ের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এ ধরনের ছড়া গান বা কবিতাগুলো লোকজীবনচর্যায় সৃজিত হয়ে অদ্যাবধি প্রজন্মান্তরের ধারায় মৌখিকভাবে প্রচলিত রয়েছে। Verbal Art বা মৌখিক শিল্পকলা তথা ফোকলোরের মাধ্যমে স্থানীয় ইতিহাস যে রচিত ও প্রচারিত হয়ে থাকে এইসব উপদান তার জ্বলন্ত প্রমাণ। পঞ্চগড়ের গ্রামীণ দরিদ্র মানুষেরা অর্থে-অস্ত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের হয়তো যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে নাই কিন্তু তাদের ফোকলোরিক মননশীলতায় অনুপ্রাণিত করেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রামী করেছে। পাকিস্তানিদের আধুনিক অস্ত্রের বিপরীতে গ্রামীণ স্তরের লোককবির এই ছড়া, গানগুলোই ছিল বিকল্প ও শক্তিশালী অস্ত্রতুল্য। যা মুক্তিযোদ্ধা ও তরুণ-যুব-সমাজকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং মুক্তির সংগ্রামকে বেগবান করতে সহায়তা করেছে। তাই মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু যেমন একটি অভিন্ন চেতনা, পঞ্চগড়ের ফোকলোরিক উপাদানগুলোও তেমনি এ অঞ্চলের যুদ্ধে ছিল আরেকটি অভিন্ন চেতনার বহিঃপ্রকাশ। এইসব মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ফোকলোরিক উপাদান নিয়ে মাঠপর্যায়ে অধিকতর গবেষণা হলে মহান মুক্তিযুদ্ধের অঞ্চলভিত্তিক সঠিক ও নির্মোহ ইতিহাস আবিস্কৃত হবে। যার মধ্য দিয়ে জাতির মুক্তিযুদ্ধের পরিপূর্ণ ইতিহাস রচিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃত ইতিহাস বলতে এ ধরনের জনপ্রবাহের ইতিহাসকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কেননা প্রচলিত সেই ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে শাসকরাই থাকে একমাত্র নায়ক। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের নিচে যে বিশাল জনতা থাকে, তাদের সুখ-দুঃখ, যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা, ব্যথা-বেদনা ও জ্বালা-যন্ত্রণার কথা কিছুই লিখিত হয়না। এই জনপ্রবাহের ইতিহাসই রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশের প্রকৃত ইতিহাস ছিলো। তাই প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানে এ ধরনের ফোকলোরভিত্তিক গবেষণা-আলোচনা ও বিশ্লেষণ আজ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির দৃঢ় অবস্থান প্রকাশ ও বিকাশে জরুরি হয়ে পড়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

ড. নাজমুল হক, *পঞ্চগড় জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮।
শফিকুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাসঃ পঞ্চগড় জেলা*, তাম্রলিপি, ২০১৭।
মুনতাসীর মামুন (সম্পা), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, সপ্তম খণ্ড, সময়, ঢাকা, ২০১৩
ড. অতুল সুর, *বাঙালা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি*, সাহিত্যালোক, কলকাতা, ২০১৪।
সুলতান আহমদ, *৬নং সেক্টর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (অপ্রকাশিত থিসিস), কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।
আজিজ উল্লাহ, জামিউল আহসান, রুহুল আমীন, শোভন বিশ্বাস, শহীদুল্লাহ আহমদ, ফারুক হোসেন রচিত ক্ষেত্রসমীক্ষা প্রতিবেদন, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।

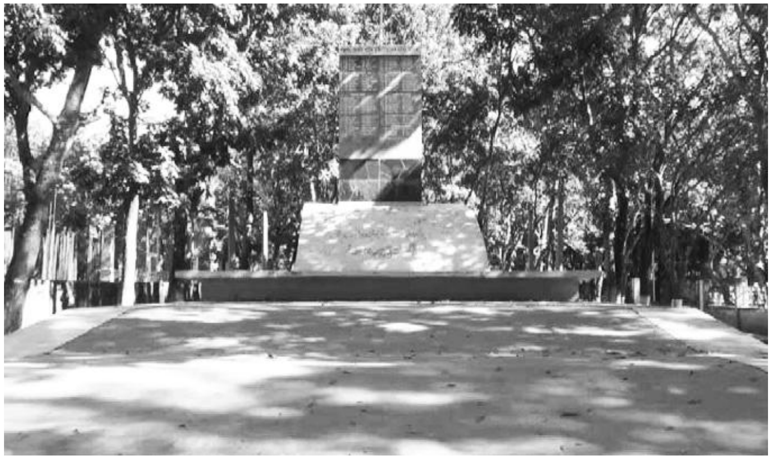

ছবি: মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ, পঞ্চগড়

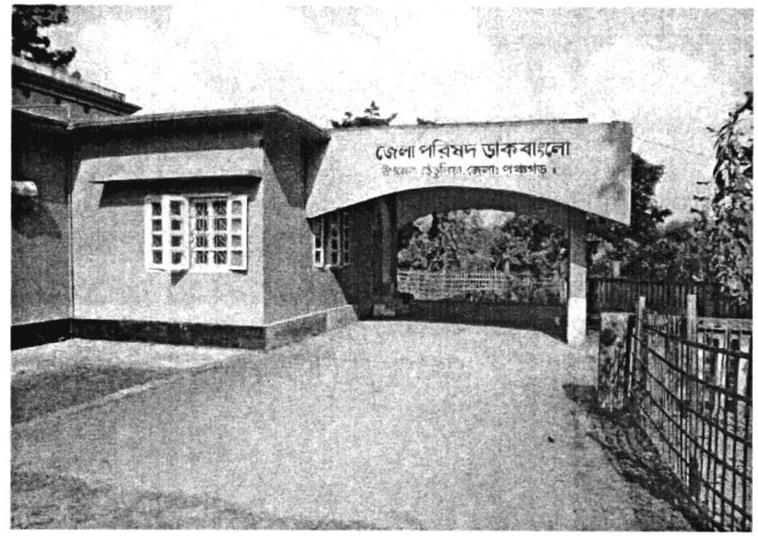

ছবি: তেঁতুলিয়া ডাকবাংলো: মুক্তাঞ্চলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র

ছবি: তেঁতুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়: মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর ছাউনি

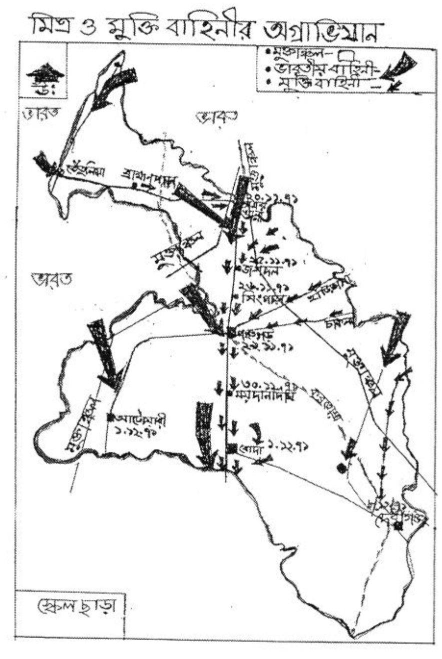

টার্গেট অমরখানা ও পঞ্চগড়ঃ মুক্তি ও পাক বাহিনীর অবস্থান

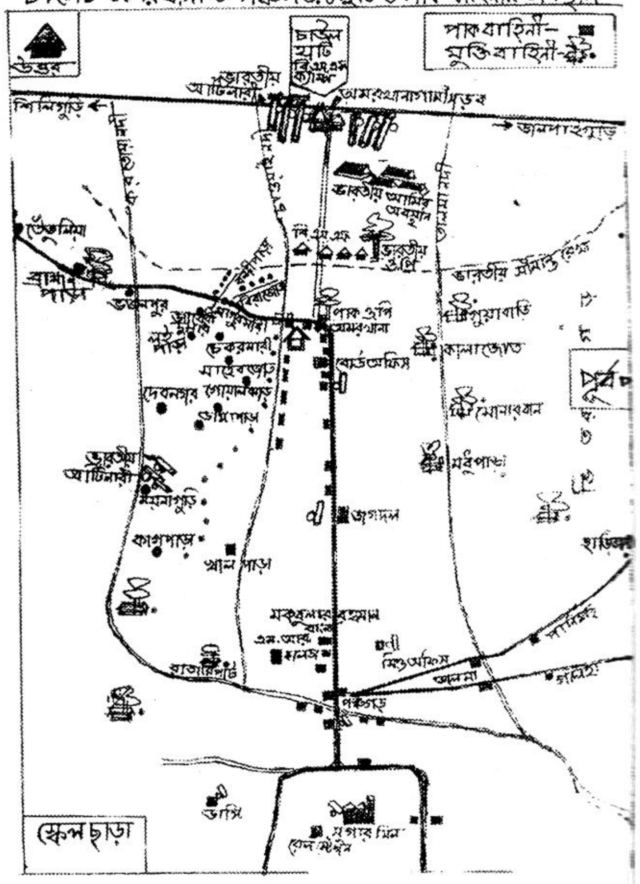

পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থানঃ